সি সি টি ভি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

নেলসন

অর্ণব সান্যাল

প্র কা শ ন

সিসিটিভি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
নেলসন ও অর্ণব সান্যাল
গ্রন্থস্বত্ব © লেখকদ্বয় ২০২৪
প্রচ্ছদ: মানব

প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ডিসেম্বর ২০২৪

CCTV Dwara Niyantrita
[CONTROLLED BY THE CCTV]
by Nalson And Arnab Sanyal
Copyright © Authors 2024
Cover Designed by Manob
First Published: December 2024 by Dyu Publication

www.dyu.com.bd
ISBN: 978-984-99034-9-9
Printed & Bound in Bangladesh

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form, of by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the author and publisher, except where permitted by law.

উৎসর্গ

সেইসব মানুষদের,
যারা সিসিটিভি ক্যামেরা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দেখলেই
খানিকটা সোজা হয়ে যান এবং
সচকিত হয়ে খোঁজেন ক্যামেরার চোখ!

সূচিপত্র

সেলিম খান

ভূমিকা ৯

দোহাই ১৩

নেলসন

ক্ষমতাঃ নায়ক কে ১৫

সমাজ, প্রতিযোগিতা ও বলপ্রয়োগ ১৭

বৈশ্বিক মেরু ২২

ক্ষমতা কী? ২৮

ক্ষমতা ও সহিংসতার সামাজিকীকরণ ৩৯

ক্ষমতার একচেটিয়াকরণ ৪৭

একচেটিয়া শাসনের ভাগীদার ৫৭

একচেটিয়া শাসনে সংবাদমাধ্যম ৬৩

নজরদারি ও গুজবের পণ্যায়ন ৭২

একচেটিয়া শাসকদের প্রচার কৌশল ৮৬

একচেটিয়া শাসন ও প্রতিক্রিয়াশীলতা ৯৩

রেড নোটিশ ৯৯

বাংলাদেশ পরিস্থিতি ১০৮

সত্যোত্তর যুগ ১২১

ভবিষ্যতের ক্ষমতা ১২৭

তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জি ১৩৪

অর্ণব সান্যাল

একনায়ক যখন ফ্যাসিস্ট ১৩৭

ফ্যাসিবাদ আসলে কী ১৩৯

ফ্যাসিস্ট চিনবেন যেভাবে ১৪৭

ফ্যাসিবাদ যেভাবে কাজ করে ১৫৭

ফ্যাসিস্টরা যেভাবে ক্ষমতায় আসে ১৬৬

১ম ধাপ: মোহভঙ্গের আশ্রয়ে প্রকাশ্যে আবির্ভাব

২য় ধাপ: রাজনৈতিক দল হিসেবে বৈধতা প্রতিষ্ঠা

৩য় ধাপ: ডানপন্থীদের সঙ্গে মিশে শক্তিমত্তা অর্জন

৪র্থ ধাপ: প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব খাটাতে ক্ষমতার ব্যবহার

৫ম ধাপ: আমূল সংস্কার প্রক্রিয়া সম্পাদন

ফ্যাসিবাদের অর্থনীতি কীভাবে চলে ১৭৮

ফ্যাসিবাদ: বর্তমান বিশ্ব ও বাংলাদেশ ১৮৭

তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জি ২০১

ভূমিকা

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে কিছু মহীয়ান!

আমার দুই সতীর্থ তাঁদের বইয়ের ভূমিকা লেখার ভার আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু এই অসীম ভার বহনের ক্ষমতা দায়িত্বপ্রাপ্তের আছে কিনা—সে বিবেচনায় একটু বেশি গুরুত্ব দিলে বোধকরি উপকারটা তাঁদেরই বেশি হতো।

এক মানুষের কত রূপ—কখনো সে ত্রাতা, কখনো-বা হন্তারক। কখনো নায়ক, কখনো খলনায়ক; কখনো সে প্রজাহিতৈষী, কখনো চরম কর্তৃত্ববাদী। রূপের তাহার নাইকো শেষ। যত রূপই থাকুক অধ্যাপক ইউভাল নোয়াহ হারারির কথামতো—গত ৭০ হাজার বছরের হোমো স্যাপিয়েন্সদের ইতিহাসের অভিমুখ প্রায় একই দিকে। এবং তা আত্মবিনাশী। তবে মানুষের মস্তিষ্কের সক্রিয়তা, অতি সক্রিয়তা যেদিকে যাচ্ছে, তা ভেঙে দিচ্ছে আজন্মলালিত নানা বিশ্বাস। স্বপ্নকে করছে বাস্তব। আবার উল্টোদিকে অতিরিক্ত ক্ষমতায়িত করছে খুব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে। সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন ধবকুবের আছেন, তেমনি আছেন লোকরঞ্জনবাদী একনায়ক, আছেন তাদের বুদ্ধিদাতা অসম্ভব মেধাবীরা। এই অতি অল্পরাই মিলে

আট শ কোটি মানুষের পৃথিবীটাকে শাসনে-শোষণে ছিবড়ে ফেলছে।

ফজলুল কবির (নেলসন) ও অর্ণব সান্যাল ঠিক এই দিকটিতে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। এটা করতে গিয়ে তাঁদের বিস্তর পড়াশোনা করতে হয়েছে সন্দেহ নেই। আমাদের জন্য লাভ হলো, এই বিস্তর তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডারকে একটি ছোট্ট পরিসরের মধ্যে উপহার হিসেবে পাওয়া। বইটির বিষয়াবলী নিয়ে এখানে আলোচনা করে পাঠকের আগ্রহে কোনো ভাটা পড়ুক, তা আমি চাই না। কারণ বিষয়টি এতটাই সময়োপযোগী ও আকর্ষণীয় যে, পাছে আমার কথা শুনে পাঠকেরা বিভ্রান্ত হন!

একটু আগেই আমরা মানুষের নানা রূপের কথা বলছিলাম। আপনি ভাবুন 'ক্ষমতা' শব্দটির কথা। পদার্থ বিজ্ঞানে একরকম, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আরেক রকম। আর এই বিশেষ্য পদের আগে-পরে বিশেষণ বসালে তো কথাই নেই। দুনিয়ায় ক্ষমতাই যেন শেষ কথা। আর সেই দুনিয়া হলো 'সভ্য' মানুষের দুনিয়া। যে 'সভ্য' মানুষের একক সিদ্ধান্তে দুটি শহর পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যেতে বসে, যাদের মিথ্যা বয়ানে ১০ লাখের বেশি নিরস্ত্র মানুষ প্রাণ দেয় শুধু এই অপরাধে যে, তারা একটি বিশেষ দেশের বাসিন্দা। ভিয়েতনামে নাপাম বোমায় ঝলসানো শিশুর ছবি পুরস্কার পায়, নিয়মিত বিরতিতে নামি-দামি সংবাদমাধ্যমে ছাপা হয়; কিন্তু 'সভ্য' মানুষের বোমা হামলা বন্ধ হয় না। তখন মনে হতেই পারে এই 'সভ্য' মানুষগুলোর কাছে এসব ছবি বা ঘটনাবলী একটি সাংবাৎসরিক উৎসব। বীভৎসতার মধ্যে আনন্দ লাভের এক কদর্য অভিরুচি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "'সিভিলিজেশন', যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তরজমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ

আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, মনু তাকে বলেছেন সদাচার।” এই সদাচার আজ বিস্মৃত। সভ্য দেশের ছোঁয়ায় আজ আমাদের মতো দেশগুলোতেও তা কদাচারে পরিণত হয়েছে। ফলে কোনটা সভ্যতা আর কোনটা বর্বরতা—তা আপেক্ষিক হয়ে পড়েছে। গাজা ও আশপাশের এলাকায় এক বছরে ৫০ হাজার মানুষকে হত্যা করাটা ইসরায়েল ও তার মিত্র আমেরিকাসহ অনেক দেশের কাছে আত্মরক্ষার অধিকার। বাদবাকি বিশ্বের কাছে তা গণহত্যা বা জেনোসাইড। এই যে সাধারণ ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা নিয়েও মানুষের মধ্যেকার বিভেদ, তা-ই তাকে মানব থেকে দানবে পরিণত হতে সাহায্য করছে। এই দানব কখনো ফ্যাসিস্ট, কখনো একনায়ক, কখনো স্বৈরাচার—নানা নাম নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। লেখকেরা চেষ্টা করেছেন এই দানবের মুখোশ উন্মোচনের—যা একেবারেই সহজ কাজ নয়। কারণ তাঁরাও কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে সময় কাটিয়েছেন ও কাটাচ্ছেন।

একটি কর্তৃত্ববাদী শাসনে টিকে থাকতে হলে সরকার দ্বারা আরোপিত বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপগুলোকে মেনে নিতে হয়, মেনে চলতে হয়। কারণ এখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, রাজনৈতিক ভিন্নমতের স্থানাভাব এবং নিরঙ্কুশ আনুগত্যই ক্ষমতার কাছে থাকার একমাত্র অবলম্বন। নজরদারির মাধ্যমে তা প্রতিনিয়ত নিশ্চিত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে চলেছে। কিন্তু মানুষ তো বুদ্ধিমান জীব। সে-ও ঠিকই টিকে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

আর এই ব্যবস্থার নাম স্ব-আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বা সেলফ সেন্সরশিপ, যাকে আমাদের মতো আমজনতা বলে থাকে, ‘না, বাবা ওটা করা যাবে না/ ওটা করব না।’ এভাবে ক্ষমতা-

নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। পাশাপাশি এজন্য কোনো সামাজিক চাপ তৈরি হলে কীভাবে বিসর্জিত সম্মানের বিনিময়ে তা রক্ষা করা যায়—সেটাও মানুষ শিখে নেয়। শিখতে শিখতে মাত্র একটাই জীবন পার করে দেয়। শিখে যায়, সবকিছু হারানোর বিনিময়েও আর কষ্ট না পাওয়াই তার একমাত্র অধিকার।

একটাই অনুরোধ, ভূমিকা পড়তে গিয়ে হতাশাবাদীদের দলে নাম লেখাবেন না। মানুষের ইতিহাস সমস্ত চাপ, দাপট, অপশাসন ও ক্ষমতার দাপটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস। 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি/ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি/ ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া' সে নিজেকে চির বিদ্রোহী বলে প্রমাণ রাখে। সেখানেই আশার সূর্য দেদীপ্যমান।

সেলিম খান
১৯ নভেম্বর ২০২৪
ঢাকা

দোহাই

বাংলাদেশের রাজনীতির হালনাগাদ ঘটনাপ্রবাহ ও ৫ আগস্টের আগে-পরের নানা উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত হলেও, বইটির উদর এ পালাবদলের বহু আগেই জন্ম নিয়েছে। বইটিতে থাকা কিছু বিষয়ের ওপর লেখা সংক্ষিপ্তভাবে এরই মধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে যারা আমাদের লেখার সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের কাছে কিছু প্রসঙ্গ ও আলাপ পরিচিত ঠেকতে পারে। বিশেষত বিগত এক দশকে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংবাদমাধ্যমে ক্ষমতার ধারা ও পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ে আমাদের বেশ কিছু উপসম্পাদকীয় ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। তবে চলমান ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে মতামত ও বিশ্লেষণধর্মী সেই লেখাগুলোয় স্বাভাবিকভাবে প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলোই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে একচেটিয়া ক্ষমতা ও ফ্যাসিবাদের চরিত্র, ধরন ও পরিণতি সম্পর্কিত বিশ্লেষণগুলোকে এক জায়গায় আনার লক্ষ্যে আমরা কাজ শুরু করি। এরই মধ্যে জুলাই-আগস্টের ঘটনাপ্রবাহ ও বড় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে যায় দেশে। ফলে এই উদাহরণ স্বাভাবিকভাবেই ঢুকে পড়েছে। ৫ আগস্ট ও তার আগে-পরের যেসব ঘটনার উল্লেখ বইটির মূল আধেয়র সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে, সেটুকুই কেবল যুক্ত করা হয়েছে। বইটি পাঠকের কাছে পৌঁছালে এবং এ বিষয়ে বিদ্বৎজনের মতামত

ও প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে একে আরও পরিণত করা সম্ভব, যা বইটির পরবর্তী সংস্করণে উপস্থাপনের চেষ্টা করব। ক্ষমতা, এর প্রভাব ও পরিণতি নিয়ে আমাদের জানা ও বোঝার চেষ্টা চলতে থাকবে। আমরা চাই সমাজ ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা ক্ষমতার জালকে এড়িয়ে না গিয়ে, তা নিয়ে আলোচনা হোক। বিশ্লেষণ হোক।

নেলসন
অর্ণব সান্যাল
ঢাকা, ২০২৪

ক্ষমতা সায়কে

নেলসন

সমাজ, প্রতিযোগিতা ও বলপ্রয়োগ

সমাজে কি বলপ্রয়োগ বাড়ছে? একেবারে গোড়া থেকে, উপরের স্তর পর্যন্ত মানুষেরা কি অন্যদের ওপর আগের তুলনায় বেশি বলপ্রয়োগ করছে? এ প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর নেই। এ নিয়ে সেভাবে গবেষণা হয়নি। তবে কিছু ঘটনার দিকে নজর দিলে এমন কিছু বিষয় উঠে আসে, যা ভাবতে বাধ্য করে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ২০১৮ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

এটি একটি হত্যার ঘটনা। বাংলাদেশে প্রতিদিন কতই তো খুন, হামলা ইত্যাদি হয়। সেগুলোর যেকোনো একটিকে উদাহরণ হিসেবে নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। বিষয়টিকে সেভাবেই দেখা যাক। ঘটনা কিছুই নয়। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শারমিন আক্তার নামের এক কিশোরীকে হত্যা করেছিল তার প্রেমার্থী এক তরুণ। ঘাতকের নাম সোহেল। সংবাদমাধ্যমে তার পরিচয় হিসেবে 'বখাটে' শব্দটি লেখা হয়েছিল সে সময়। এ ধরনের ঘটনায় সাধারণত এভাবেই লেখা হয়। ব্যতিক্রম কিছু নেই। এই 'বখাটে' শব্দটি ভীষণ শক্তিশালী। এই শব্দের আড়ালে প্রায়শই অপরাধীর পরিচয় হারিয়ে যায়। সেই পরিচয়, যার জোরে কেউ একজন অপরাধ করার একটি ফ্রি-পাস পেয়ে যায়।

ঘটনার সময় শারমিনের বয়স ছিল ১৬ এবং সোহেলের ২৫। তরুণ সোহেলের নিশ্চয় হাজারটা স্বপ্ন ছিল। আর শারমিনের সামনে তো ছিল পুরো জীবন। কিন্তু একটি ঘটনাই তাদের জীবনে এমন এক রেখা টেনে দিল, যা তাদের পরিচয়কেই পাল্টে দিল। একজন পরিণত হলো মরদেহে, আর অন্যজন ঘাতকে। সোহেল নাকি প্রেমে পড়েছিল শারমিনের। তাকে পেতে চাইত সে। সংবাদমাধ্যমে শারমিনের ভাইয়ের যে বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে, তাতে সোহেল অন্য কারও সঙ্গে শারমিনকে দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার বক্তব্য ছিল, 'আমার না হলে সে অন্য কারও হতে পারবে না।' শারমিনের প্রত্যাখ্যানে সোহেল নিজের দিকে তাকায়নি। এমন কোনো প্রস্তুতিও তার ছিল না। এই একটি কথা, এই একটি মনোভঙ্গিই চিন্তিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

বখাটে তকমার আড়ালে সোহেল রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর কোনো অংশীদার ছিল কিনা, সে প্রশ্নের উত্তর সেভাবে জানা যায় না। কিন্তু সে ক্ষমতার চর্চা করেছে শারমিনকে হত্যা করে। এবং সেটা প্রচলিত ও ক্রম ক্ষয়মাণ ক্ষমতার সংজ্ঞা মেনেই। 'শারমিন আমার না হলে, আর কারও হবে না'—সোহেলের এই মনোভঙ্গি অনেকটা কি তথাকথিত স্বঘোষিত দেশপ্রেমীদের সঙ্গে মিলে যায় না, যারা ভাবে 'দেশকে আমিই সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসি, তাই এর মঙ্গল-অমঙ্গল ভাবনার একমাত্র এখতিয়ার আমার।' এই স্বঘোষিত প্রেমিকেরা ভাবে, দেশ ও জাতির মঙ্গল করার 'সোল এজেন্ট' তারাই। এই ভাবনার বিপদ হচ্ছে, এটি জেঁকে বসতে বসতে একসময় অন্ধ হয়ে যায়। একসময় নিজেকে ছাড়া আর কিছু সে দেখতে পায় না। অন্য কারও মত ও পথের প্রতি তার সম্মানবোধ কমতে থাকে, যা একসময় অসহনশীলতায় পরিণত হয়। শীর্ষ স্থানটি ছাড়া আর সবকিছুই তখন তার কাছে অনুল্লেখযোগ্য মনে হয়। এরা নিজের

বৈশ্বিক মেরু

একের পর এক সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থা চিহ্নিত হয়ে আছে। এই ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে হাজির ছিল—স্নায়ুযুদ্ধের বাস্তবতা। লড়াই হিসেবে এর যাত্রা যদিও অনেক আগে। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামো ও সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যকার আগের লড়াইটি সেভাবে আলোচনায় আসে না, সেভাবে কেন্দ্র গড়ে না ওঠার কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠিক এ জায়গাটিই তৈরি করে দিল। দেশে দেশে চলা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও লড়াইয়ের কেন্দ্র হিসেবে এটি যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামনে হাজির করল, তেমনি পুঁজির মক্কা হিসেবে এটি যুক্তরাষ্ট্রকে হাজির করল। পুঁজির অন্য পীঠস্থানগুলো মাঠ থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো, যুদ্ধে নাকাল হয়েই।

এই বাস্তবতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক কাঠামোয় একের পর এক অঞ্চল স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। আর এই সদ্য স্বাধীন দেশগুলোকে নিয়ে শুরু হলো টানাটানি। কোন মেরু কতজনকে টানতে পারে—এই ছিল প্রতিযোগিতা। কে কার কাছে নিরাপত্তা চাইবে এবং কোন মেরুর নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষমতা কতটা—এই হিসাবে বসে চলল নিরন্তর সামরিকীকরণ। দুই মেরুর মধ্যে সরাসরি সে

ক্ষমতা কী

ক্ষমতা কী? এই প্রশ্ন ছোট কিন্তু ভারী।

সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে কিছু পরিস্থিতির বর্ণনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, আপনি হেঁটে যাচ্ছেন বেশ জোর কদমে। একে টপকে, ওর পা মাড়িয়ে ছুটছেন। কিন্তু হঠাৎ রাস্তার মোড়ে জটলা দেখে আপনার চলার গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে এল। এর পর ওই জটলার মধ্যে পুলিশের পোশাক পরিহিত কয়েকজনকে দেখে আপনি ক্ষণিকের জন্য ভাবলেন যে, এই পথ ধরেই এগোবেন কি-না? এই যে ভাবলেন, এই ভাবনাটা এল কিন্তু দ্বিধা থেকে। আর এই দ্বিধার জন্ম দিল মূলত ওই জটলা এবং তাতে উপস্থিত পুলিশের পোশাক। অর্থাৎ জটলা আপনার সামাজিক মনস্তত্ত্বে আগে থেকেই একটি সাইরেন বাজিয়ে দিয়েছিল যে, ঝামেলা আছে। ওখানে প্রভাবশালী একাধিক পক্ষ থাকতে পারে। তাদের সামাজিক শ্রেণি আপনি জানেন না বলে চলার গতি কমলেও আপনি থামেননি। এর মধ্যেই যখন পুলিশের উপস্থিতি টের পেলেন, তখন নিজে কোনো অপরাধ না করলেও ঝামেলার জটিলতা সম্পর্কে আপনি কিছুটা আঁচ করলেন। এবং এই আঁচই মূলত আপনাকে দ্বিধাগ্রস্ত করল।

আপনি হয়তো সচেতনভাবে বুঝলেন না যে, আপনি এইমাত্র ক্ষমতার একটি স্তরের মুখোমুখি হয়েছিলেন। দিনে

ক্ষমতা ও
সহিংসতার সামাজিকীকরণ

ক্ষমতা দাঁড়িয়ে থাকে এক মহা-আখ্যানের ওপর। এই আখ্যানই নির্ধারণ করে দেয় কে ছড়ি ঘোরাবে, আর কে 'জি হুজুর' বলে সেই ঘোরানো ছড়ির নির্দেশনামা মেনে চলবে। সামাজিক পরিসরে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্যকে দিয়ে অনিচ্ছার কাজটি করিয়ে নিতে না পারলে ঠিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা হয় না। সেটা উপেনের কাছ থেকে মিথ্যা খতে জমি নিয়ে নেওয়াই হোক, আর কোনো উপকরণ বা উপায়ের চাক্ষুষ কোনো ব্যবহার ছাড়া অন্যকে দিয়ে পরিস্থিতি নির্বিশেষে রান্না-বান্না করিয়ে নেওয়াই হোক, কিংবা পথে যেতে যেতে গোটা দশেক সালাম আদায়ই হোক—ক্ষমতার ধর্মই হলো অন্যের ওপর কর্তৃত্বের প্রকাশ।

একটি সমাজ বা রাষ্ট্র যখনই পত্তন হয়, তখনই এই ক্ষমতার একটি স্তরবিন্যাস হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতার স্তরবিন্যাসই মূলে কাজ করে। আর এই স্তরবিন্যাসে কে কত উপরে থাকবে তা নির্ধারিত হয়, তার বলপ্রয়োগের ক্ষমতার মানদণ্ডে। এ কথা ঠিক বিপরীতভাবেও সত্য। অর্থাৎ যে যত উপরে উঠবে, তার বলপ্রয়োগের ক্ষমতা তত বাড়বে।

সমাজের প্রতিটি স্তর এই বিশেষ বিন্যাসকে মান্যতা দেয়। এই মান্যতায় কোনো হেরফের হওয়ামাত্রই ভেঙে পড়ে ক্ষমতার

ক্ষমতার একচেটিয়াকরণ

বাংলাদেশে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় ও এর মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও পলায়নের পর থেকে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। একনায়ক, স্বৈরাচার ইত্যাদি শব্দবন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রচুর বিশ্লেষণ হচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন আগেও দৃশ্যটি এমন ছিল না। কেউ এই শব্দগুলো সহজে উচ্চারণ করতে পারত না। এটাই একচেটিয়া শাসনের ফল। প্রশ্ন হলো, একচেটিয়া শাসন আসলে কী? কীভাবে নির্মিত হয়?

এ প্রশ্নের দরজায় কড়া নাড়ার আগে বিশ্বের পরিস্থিতির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। বিশ্বের ইতিহাসে রেকর্ডসংখ্যক দেশেই শুধু নয়, বিশ্বের মোট ভোটার জনগোষ্ঠীর রেকর্ডসংখ্যক অংশই ২০২৪ সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গেছে। টাইম ম্যাগাজিনের তথ্যমতে, বিশ্বের ৬৪টি দেশে নির্বাচন হয় ২০২৪ সালে। আর ভোটার জনগোষ্ঠীর সংখ্যার বিচারে বিশ্বের ৫০ শতাংশের বেশি ভোটারের সামনে ২০২৪ সালে রাষ্ট্রনেতা নির্বাচনের বিকল্প ছিল। বাংলাদেশও তার মধ্যে একটি। আর এর সঙ্গে যদি ভারত, আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, তুরস্ক, ইরান ইত্যাদি দেশগুলো যুক্ত হয়, তবে ২০২৪ সালে দেশে দেশে হওয়া নির্বাচনগুলোর গুরুত্ব অত্যধিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ এই নির্বাচনগুলোর ফল শুধু ওই দেশ

একচেটিয়া শাসনের ভাগীদার

একচেটিয়া শাসন হচ্ছে সেই শাসনব্যবস্থা, যা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিতে থাকা এক বা একাধিক উপাদানকে বা তার সবগুলোকেই খারিজ করে দেয়। এর প্রধানতম লক্ষণ হচ্ছে—ক্ষমতা সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নকে খারিজ করা এবং প্রশ্নকারীকে পীড়নের মুখে ফেলা বা ভয় দেখানো। বিচার, সংবাদমাধ্যম, নির্বাচনসহ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভিতকে ধসিয়ে দেওয়া হয় এ ব্যবস্থায়। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে জনমনে অসন্তোষ বা হাজারটা প্রশ্ন থাকলেও তার উচ্চারণের সব পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। মোটাদাগে এই হলো গণতন্ত্রের মোড়কে একচেটিয়া শাসন। এই শাসনব্যবস্থা পত্তনের পথে রাষ্ট্রীয় সম্পদের এক ধরনের ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়। প্রশ্ন হলো—কারা এই ভাগীদার?

যেকোনো শাসন ব্যবস্থাতেই ক্ষমতা (ক্ষমতা অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ও সম্পদের এক ধরনের বণ্টন হয়। মূলত সম্পদের বণ্টনের তাগিদেই ক্ষমতার পিরামিডটি তৈরি করা। আর এই পিরামিডের শীর্ষে কে বা কারা থাকবে—তা নির্ধারণের জন্যই আসে নানা ব্যবস্থা। এর মধ্যে গণতন্ত্র নিশ্চিতভাবেই একটি ব্যবস্থা। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও এক ধরনের সম্পদের বণ্টন হয়। সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যকে বুঝতে গেলে তাই এই বণ্টন ব্যবস্থাকে বোঝাটা ভীষণভাবে জরুরি।

একচেটিয়া শাসনে সংবাদমাধ্যম

যেকোনো দেশের জন্যই সংবাদমাধ্যম অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে এটি স্বীকৃত। এই স্বীকৃতির বয়সও অনেক। কারণ রাষ্ট্রের অন্য স্তম্ভগুলোর অন্দরমহলে ঘটে যাওয়া ঘটন-অঘটন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ জানতে পারে একমাত্র এর মাধ্যমেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কোনো শাসনব্যবস্থা একচেটিয়া হয়ে ওঠার পথে প্রথম আঘাতটি আসে সংবাদমাধ্যমের ওপরেই।

ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকেই সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত। সে সময় রাষ্ট্রের বাকি তিনটি স্তম্ভের মধ্যে ছিল—অভিজাত শ্রেণি, পুরোহিত (খ্রিষ্টান সমাজের বিচারে যাজক শ্রেণি) এবং ব্যবসায়ীসহ সাধারণ নাগরিকেরা। অবশ্য সেই সময়ের বিচারে সাধারণ নাগরিক বলতে এখনকার মতো সর্বসাধারণ বোঝাত না। সেই সাধারণও আসলে ছিল সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণিই। অর্থাৎ অগণিত সাধারণ এই স্তম্ভের বিচারে বাদই পড়ে গিয়েছিল বলা যায়।

আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোয়, বিশেষত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয় এই চার স্তম্ভের আবার নতুন সংজ্ঞায়ন হয়। এবার এ তালিকায় উঠে আসে—নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ। চতুর্থটি? হ্যাঁ, চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে রয়ে যায় সেই সংবাদমাধ্যমই। সংবাদমাধ্যম বা

নজরদারি ও গুজবের পণ্যায়ন

আগেই বলা হয়েছে যে, ক্ষমতা ও জ্ঞান মূলত সেই দুই সখা ও সখির মতো, যারা দুপুরে পা ছড়িয়ে কোণে বসে কানাকানি করে নিরন্তর। কেউ যদিওবা তা প্রত্যক্ষ করে, তবুও শুধু এই ভেবে বিস্মিত হয় যে, 'তোদের এত কী বলিবার আছে ভেবে অবাক হই।' যদিও এতে অবাক হওয়ার তেমন কিছু থাকে না। জ্ঞানকাণ্ড, জ্ঞান সৃজন ও তার প্রচার এই তিন চলে মূলত ক্ষমতার সরাসরি তত্ত্বাবধানে, যা ক্ষমতার পক্ষে সামজের নানা স্তরে চমস্কি কথিত 'সম্মতি উৎপাদনে'র কাজটি করে। বাংলাদেশে ক্ষমতার বদলের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবই থেকে শুরু করে জ্ঞান-সৃজন ও জ্ঞান-বিতরণ সম্পর্কিত সব প্রতিষ্ঠান ও উপকরণে কিছু বিশেষ বদলের লক্ষ্যে তৈরি হওয়া আলোচনার দিকে তাকালেও বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ফলে ভাবার কোনো কারণ নেই যে, ক্ষমতা তার জন্য ক্ষতিকর কোনো জ্ঞানের প্রচার করে বসবে গাড়লের মতো। সে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকে।

ক্ষমতাতন্ত্র শুধুই দৃশ্যমান প্রশাসনিকতার ছক মেনে চলে না। সে এ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নানা কৌশলকে আয়ত্ত ও প্রয়োগ করে। এই উভয় কৌশল আগেই বলা হয়েছে জনতাকে বিদ্যমান ক্ষমতা ও তার নিয়মগুলো সম্পর্কে অবহিত করতে প্রয়োগ হয়। বৃহত্তর গোষ্ঠী যাতে এই শিক্ষা নেয় এবং তা মেনে

একচেটিয়া শাসকদের প্রচার কৌশল

ঢেঁড়া পিটিয়ে গোটা রাজ্যে জানান দেওয়া হচ্ছে—রাজানুগ্রহ হিসেবে রাজ্যের লোকেদের জন্য কী থাকছে, কিংবা রাজ বিদ্রোহের শাস্তি হিসেবে কী নয়া বিধান এলো? রাজশাসনের সময়কার পরিচিত দৃশ্য এটি, যার দেখা মিলবে সে সময়কার পটভূমিতে নির্মিত যেকোনো সিনেমায়। মোটাদাগে হালের একচেটিয়া শাসকেরাও এই একই নীতি অনুসরণ করেন। যদিও দীর্ঘ যাত্রায় ক্ষমতা ও শাসনকাঠামোয় বিস্তর সংস্কার হওয়ায় চক্ষুলজ্জায় হোক, কিংবা পারিপার্শ্বিক চাপ সামলাতেই হোক, হুবহু এই ধারা অনুসরণ করা হয় না। তবে পুরস্কার ও চোখ রাঙানিই থাকে সর্বরোগহরা (পড়ুন সর্ববিরোধহরা) এক নিদারুণ অনুপান হিসেবে।

এখানে মনে রাখা জরুরি যে, মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে এখনো রাজ শাসন রয়েছে কিংবা যেসব দেশ মোটাদাগে একনায়ক শাসিত দেশ হিসেবেই পরিচিত, সেসব দেশ এখানে সেভাবে বিবেচ্য নয়। মূলত গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে একচেটিয়া শাসন চলছে, বা চলার পথে রয়েছে—এমন দেশগুলোই এখানে আলোচনায় আসছে।

একচেটিয়া শাসন ও প্রতিক্রিয়াশীলতা

একচেটিয়া শাসনের জন্মই হয় পুরো সমাজকে সাদা কালোয় বর্গীকরণের মাধ্যমে। এই বর্গীকরণ কিন্তু বহুলকথিত 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট' ধাঁচে হয় না; হয় 'ব্ল্যাক অর হোয়াইট' ধাঁচে। অর্থাৎ কোনো সম্মীলনের মনোভাব একেবারেই অনুপস্থিত থাকে। মুছে ফেলা হয় সাদা কালোর মধ্যবর্তী তাবৎ ধূসর অঞ্চল। পুরো সমাজকে শত্রু ও মিত্রতে বিভাজিত করা হয়। আর এই বিভাজনের রেখার গহীন থেকেই জন্ম নেয় প্রতিক্রিয়াশীলতা।

একচেটিয়া শাসনের অধীনে গোটা সমাজ বহুত্ববাদ থেকে একত্ববাদের দিকে যাত্রা করে। এই একের সঙ্গে না মিললেই যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে 'আক্রমণযোগ্য' সাব্যস্ত করা হয়। 'স্বর্ণযুগ', 'অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশত্রু মোকাবিলা', 'জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার', 'দিকে দিকে বিজয় পতাকা ছড়িয়ে দেওয়া', 'উন্নয়নের অভিযাত্রা', 'মাদক নির্মূল', 'দুর্নীতিবিরোধী অভিযান', 'সাবেক অপশাসনের বর্জ্য নির্মূল' ইত্যাদি নানা অভিধায় ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা এক বৃহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এর নির্মাণ চলে। এই প্রচারের ফলে ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে যৎকিঞ্চিৎ বা বৃহৎ সুবিধা পাওয়া জনগোষ্ঠী তৈরি

রেড নোটিশ

একচেটিয়া শাসনব্যবস্থা এক মহাআখ্যান নির্মাণ করে। একদিনে নয়, ধীরে ধীরে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, অতীতের স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তন ও তার পণ্যীকরণ, জাতীয় গৌরব অর্জন বা পুনরুদ্ধার, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে করা উন্নয়ন ধারণার প্রচার ও সে অনুযায়ী প্রকল্পভিত্তিক কর্মযজ্ঞ ইত্যাদির মাধ্যমে এই মহাআখ্যানের নির্মাণ হয়। এই আখ্যানকে প্রশ্ন করা প্রতিটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে 'শত্রু' আখ্যা দেওয়ার কাজটিও একইসঙ্গে করা হয়। এ ক্ষেত্রে জনআবেগকে কাজে লাগানো হয় দারুণভাবে।

মহাআখ্যানের নির্মাণ ও এর বিরোধিতাকারীমাত্রই শত্রুপক্ষ—এই ভিতের ওপরই মোটাদাগে দাঁড়িয়ে থাকে একচেটিয়া শাসন। এই কাজটি করার সময়ই বেশ কিছু প্রতীক ও বৈশিষ্ট্যকে এই পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে একীভূত করা হয়। কিছু শব্দ, লেবাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারণাকে উপজীব্য করেই এই প্রতীকায়নের কাজটি করা হয়, যার একেবারে শীর্ষে পুরো শাসনব্যবস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে উপস্থিত থাকেন স্বয়ং একচেটিয়া শাসক।

একইসঙ্গে এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত সংবাদমাধ্যমকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে একচেটিয়া শাসনের অবসান হয়েছে দৃশ্যগতভাবে। গত ৫ আগস্ট জুলাই আন্দোলনের ফল হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যান। ২০০৮ সালে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসার পর টানা চারবার সরকার গঠন করেছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট। খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে—২০০৮ সালে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারে আসে জোটটি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিপুল জনসমর্থন ছিল তাদের। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগেই তার জনসমর্থন কমতে থাকে। এর সঙ্গে সংবিধান সংশোধন করে তারা এমন এক কাঠামো তৈরি করেছিল, যার মাধ্যমে তারা ফের ক্ষমতায় আসতে পারে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে চাপে রাখার নীতি নিয়ে এক ধরনের স্বেচ্ছাচারে নেমে পড়ে দলটি। আর এই স্বেচ্ছাচারের পথে তারা ২০০৮ সালে তাদের জনসমর্থন তৈরির পেছনে তৎকালীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের (২০০১-২০০৬) নানা কার্যকলাপকে (দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, জঙ্গি ধারার উত্থান এবং বিশেষত জামায়াত ইসলামীর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিভিন্ন বক্তব্য ও ১৯৭১ সালে জামায়াতের ভূমিকার বিপরীতে তাদের কর্তৃত্ব নিয়ে জনমনে সৃষ্ট অস্বস্তি) সামনে হাজির করে। বিশেষত 'মুক্তিযুদ্ধ', 'স্বাধীনতা বিরোধী', 'জঙ্গি' ইত্যাদি শব্দ ও এ সম্পর্কিত মতকে পাখির

সত্যোত্তর যুগ

সত্যের লাশের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে একচেটিয়া শাসন (ভয়ের কারণ নেই। নির্মিত সত্য থাকে বহাল তবিয়তে)। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, সত্য যে মরল, সে সম্পর্কে অগণিত জনতার বেশির ভাগই উদাসীন থাকে। ফলে সত্যের মৃত্যুর ক্ষণটি আর সেভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। গোটা বিশ্বই এখন পরিচিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষয়ের কালে বাস করছে। এমনকি পশ্চিমা দেশগুলোও এ থেকে রেহাই পায়নি। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে উপস্থিত অসত্য। বলা হচ্ছে—পৃথিবীর মানুষ এখন এক 'পোস্ট-ট্রুথ এরা' বা সত্যোত্তর যুগে বাস করছে।

সত্যোত্তর যুগ বুঝতে হলে তো আগে সত্যকে বোঝা চাই। এমনিতেই বড় গোলমেলে বিষয় এই সত্য। তবু এর ঠিকুজি বের করতে গেলে গ্রাহ্য সংজ্ঞাগুলোর কাছেই যেতে হবে। প্রথমেই আসা যাক, সত্য শব্দের অর্থের কাছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষে* 'সত্য' শব্দের অর্থ হিসেবে সরাসরি যে অর্থগুলো পাওয়া যায়, তার মধ্যে রয়েছে—যথার্থ, বাস্তব, বিশুদ্ধ ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও যে অর্থগুলো বিভিন্ন অভিধানে প্রস্তাব করা হয়, তার মধ্যে আছেঃ প্রকৃত, নির্ভুল, নিত্যতা, বিদ্যমানতা ইত্যাদি। আর ইংরেজি 'ট্রুথ' শব্দটি বিশ্লেষণ করলেও একই ধরনের অর্থের দিকেই যেতে হয়।

ভবিষ্যতের ক্ষমতা

এ বাস্তবতাতেই প্রশ্ন আসে, তাহলে ভবিষ্যতের ক্ষমতা কেমন হবে? তার আগে তো জানা-বোঝা দরকার যে, ভবিষ্যতের দুনিয়া কেমন হতে পারে। নিশ্চিতভাবেই প্রযুক্তিকেন্দ্রিক। সে দুনিয়া হয়তো কৃত্রিমতায় ভরপুর থাকবে। শুধু বুদ্ধিমত্তা নয়, মাংস থেকে শুরু করে মানুষ—সবই হয়তো সে পথে এগোতে পারে।

বিষয়টি বুঝতে একটু হালের নানা গবেষণার দিকে চকিতে নজর দেওয়া যাক।

স্বর্গের সিঁড়ি তৈরির কত চেষ্টার গল্প আছে পৃথিবীতে। কেন স্বর্গ? সেও এক অমরত্বের খোঁজ। কারণ সব ধর্ম ও পুরাণমতেই স্বর্গ হচ্ছে সেই স্থান যা অনন্তযৌবনা, যেখানে নেই কোনো জরা, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—নেই মৃত্যু। এই মৃত্যু জয়ের রথই তো ছুটিয়েছে মানুষ। নানা কালে ক্ষমতাশালীরা, বিত্তবানেরা এই অমরত্বের দেখা পেতে কী না করেছে।

ভারতীয় পুরাণের দিকে তাকালে এই অমরত্বের জন্য কত না লড়াই, কত না প্রতিযোগিতার দেখা মিলবে। ধরা যাক সেই সমুদ্রমন্থনের কথাই, যেখানে সবার শেষে দেবতাদের হাতে এসেছিল অমৃত। এই অমৃত কী? পুরাণমতে, অমৃত হচ্ছে সেই আরাধ্য, যা দেবতাদেরকে দিয়েছে অমরত্বের স্বাদ। গ্রিক

একনায়ক যখন
ফ্যাসিস্ট

অর্ণব সান্যাল

ফ্যাসিবাদ আসলে কী

মতবাদ হিসেবে ফ্যাসিজম বা কে ফ্যাসিস্ট—এই বিষয়টি এখন আমাদের দেশের অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে এই আলোচনার প্রাবল্য বাড়লেও, গত কয়েক বছর ধরেই এই ফ্যাসিজম নিয়ে এ দেশের রাজনৈতিক মহলে নানা কড়চা শোনা যাচ্ছে। কেউ কাউকে ফ্যাসিস্ট বলে অভিধা দিচ্ছেন, তো কাউকে বলা হচ্ছে ফ্যাসিস্টের দোসর। কিন্তু ফ্যাসিজম আসলে কী? ফ্যাসিস্ট চেনার উপায়ই বা কী কী? ফ্যাসিবাদ কাজ করেই বা কীভাবে? কিংবা বাংলাদেশেই এই শব্দবন্ধের ব্যবহার এতটা কেন?

ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিস্ট শব্দদুটি উচ্চারিত হলেই মূলত দুটি ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটি হচ্ছে নাৎসি জার্মানির বা হিটলারের জার্মানির। অন্যটি হচ্ছে বেনিতো মুসোলিনির ইতালি। এই দুটি হলো প্রমাণিত সত্যের মতো ফ্যাসিজমের উদাহরণ। সাধারণত বিশেষজ্ঞদের বেশির ভাগ এ দুটিকে ফ্যাসিজমের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ধরে থাকেন। তবে হ্যাঁ, এ নিয়েও বিতর্ক আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার এই দুই উদাহরণের পর মূলত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যবস্থা বা আন্দোলন ‘ফ্যাসিজম’ বা ‘ফ্যাসিস্ট’ হিসেবে উপাধি পেয়েছে। তবে সেগুলোকে প্রমাণিত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

তুমুল বিতর্ক চলেছে সেসব দাবি নিয়ে। কারণ ফ্যাসিজম নামক রাজনৈতিক আদর্শের ধারণাটিকেই নানা সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায়। এর বৈশিষ্ট্যও হরেক। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীতে এসব বৈশিষ্ট্য আরও নানামুখী হয়েছে। ফলে ফ্যাসিস্ট উপাধিটি রাজনৈতিকভাবে যে কাউকে দেওয়া গেলেও, সেটি প্রমাণ করা কঠিন।

ফ্যাসিজম একটি রাজনৈতিক আদর্শ। ল্যাটিন শব্দ 'ফ্যাসেস' থেকে নিজের রাজনৈতিক দলের নামকরণ করেছিলেন ইতালির বেনিতো মুসোলিনি। এ দিয়ে মূলত গাছের ডাল বা কাঠ দিয়ে শক্ত করে বাঁধা কুঠারকে বোঝানো হয়। ব্রিটানিকা বলছে, প্রাচীন রোমে দণ্ডপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রতীক হিসেবে এই ফ্যাসেসকে বোঝানো হতো। আশা করি, এখন শব্দগতভাবে কিছুটা হলেও ফ্যাসিজমের একটি অবয়ব চোখের সামনে আবির্ভূত হচ্ছে। তবে মুসোলিনি যে ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দল তৈরি করেছিলেন, সেটির সঙ্গে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের গুণগত পার্থক্য আছে। অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের হলেও এই দুটির কর্মপ্রক্রিয়ায় ভিন্নতা আছে। আবার এদের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্যে মিলও আছে। যেমন: দুই ক্ষেত্রেই উগ্র জাতীয়তাবাদের সামরিকায়ন চোখে পড়বে। ভোটের মাধ্যমে সৃষ্ট নির্বাচনী ব্যবস্থাভিত্তিক গণতন্ত্রের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা পরিলক্ষিত হবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদারবাদের পরিসর সংকুচিত করার চেষ্টা দেখা যাবে। এগুলো একেবারে মোটা দাগের কিছু বৈশিষ্ট্য। তবে এসব নিয়েও ইতিহাসবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে, ফ্যাসিজমে রক্ষণশীলতার চরম রূপ প্রবল হয়ে উঠতে পারে। হঠাৎ করেই সাধারণ মানুষের মনে হতে পারে যে, তাকে যেন জোর করে পেছনের দিকে হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে!

ফ্যাসিস্ট চিনবেন যেভাবে

এবার চলুন ফ্যাসিস্ট চেনার লক্ষণ বা উপায় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ফ্যাসিজমের লক্ষণ নিয়ে নানা বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন। এখানে আমরা উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করব। শুরুতেই উমবের্তো একো'র রচনায় চোখ বোলানো যাক। এই বিখ্যাত দার্শনিক ও সাহিত্যিক মুসোলিনির দেশেরই মানুষ এবং মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৯৯৫ সালে তিনি 'উর-ফ্যাসিজম' নামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। ওই বছর *দ্য নিউইয়র্ক রিভিউয়*র ২২ জুন সংখ্যায় এটি প্রকাশিতও হয়েছিল। এর আগে একই বছরের এপ্রিল মাসে উমবের্তো কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে এই ডিসকোর্স নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তব্যে উমবের্তো একো ইতালির ফ্যাসিবাদ নিয়ে যেমন বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন, ঠিক তেমনি ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থাকে চেনার সুবিধার্থে কিছু লক্ষণ বা চিহ্নের উল্লেখ করেছিলেন। ১৪টি বৈশিষ্ট্যের কথা উমবের্তো লিখেছিলেন। সেগুলোই এবার একে একে তুলে ধরা হলো:

১. ফ্যাসিস্টরা বরাবরই ঐতিহ্যের চেতনাধারী হন, ঐতিহ্যের কথা বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন। একো বলেছেন, ফ্যাসিবাদের চেয়ে অনেক বেশি পুরোনো মতবাদ হলো ঐতিহ্যবাদ। তাঁর কথায়, 'প্রতিটি ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের সিলেবাস ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই প্রধান ঐতিহ্যবাদী চিন্তকদের খুঁজে পাওয়া যাবে।' এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ফ্যাসিস্টদের শেখার প্রক্রিয়ায় কোনো উন্নতি আসে না। কারণ একোর মতে, এক্ষেত্রে সত্য সবার জন্য একবারই উচ্চারিত হয় এবং এ দিয়ে বোঝানো অস্পষ্ট বার্তাকেই বারংবার নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

২. আধুনিকতাকে বর্জনের চিহ্ন দেখা যায় পুরোপুরি। ঐতিহ্যবাদকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই এটি হয়। একো বলেছেন, 'জ্ঞানের মাধ্যমে আলোকিত হওয়া, যুক্তির যুগকে ফ্যাসিস্টরা আধুনিক ভ্রষ্টাচারের শুরু হিসেবে মনে করে থাকে।' ফলে বার বার উচ্চারিত হতে থাকে 'যুক্তিতে মুক্তি মেলে না' ঘরানার বক্তব্য। সেদিক থেকে ফ্যাসিজমে যুক্তি পাত্তা পায় না একেবারেই। তাই অযৌক্তিকতার তুমুল ব্যবহারও ফ্যাসিজমের একটি অন্যতম লক্ষণ।

৩. এই অযৌক্তিকতার চর্চার কারণে দেখা দেয় প্রতিক্রিয়াশীলতা। এক্ষেত্রে সত্যিকারের মৌলিক ক্রিয়ার দেখা মেলে না। শুধুই একটি ঘটনা ঘটেছে বলেই আরেকটি ঘটনা ঘটানো হয়। উমবের্তো একো বলেছেন, 'যে কোনো ক্রিয়ামূলক কর্মকাণ্ড তার নিজস্বতায় সুন্দর হয়ে ওঠে। এটি সম্পাদন করতে হয় পূর্ববর্তী কোনো কাজের প্রতিফলন ব্যতিরেকে।'

ফ্যাসিবাদ যেভাবে কাজ করে

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখা যাবে, পুরো শতকজুড়েই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুনির্দিষ্ট সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ফ্যাসিবাদের উত্থানের পথ তৈরি করে দিয়েছে। প্রধানত, বিশ শতকজুড়ে বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংকট চরম হয়ে ওঠার কারণে ফ্যাসিবাদী শাসন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালি ও জার্মানিতে জাতীয় সংকট (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক) ঘনীভূত হওয়ায় সাধারণ জনতা বিকল্প খুঁজতে থাকে। আর সেই সুযোগেই আবির্ভূত হয় ফ্যাসিবাদী আদর্শ। জনগণকে স্বপ্ন দেখায় গৌরবের রাষ্ট্র নির্মাণের। আর তাতে আকৃষ্ট হয়ে দেশের ভবিষ্যৎ ফ্যাসিবাদীদের হাতে তুলে দেয় জনতা। আর ক্ষমতা কাঠামোতে খানিক স্থান পেয়েই তা সুসংহত করতে উঠেপড়ে লাগে ফ্যাসিবাদী। এমন এক নাগপাশ রচনা করা হয়, যা থেকে সবার মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

ফ্যাসিবাদ নিয়ে বিখ্যাত রুশ বিপ্লবী, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক তাত্ত্বিক লিও ট্রটস্কি ১৯৩১ সালের ১৫ নভেম্বরে এক ব্রিটিশ কমরেডকে চিঠি লিখেছিলেন। ১৯৩২ সালের ১৬ জানুয়ারি *দ্য মিলিট্যান্টে* তা প্রকাশিত হয়। ওই চিঠিতে তিনি

ফ্যাসিস্টরা যেভাবে ক্ষমতায় আসে

ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে প্রধান পুঁজি থাকে সামাজিক ক্ষোভ। অর্থাৎ কোনো দেশ বা সমাজের মানুষ যখন নানা বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এক ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষোভ ও উত্তেজনা দানা বাঁধতে থাকে, ঠিক সেই অস্থির সময়টাকে পুঁজি করে ফ্যাসিস্টরা। একে ভিত হিসেবে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে এগোনো শুরু করে ফ্যাসিবাদ।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ফ্যাসিবাদীরা প্রথমে একটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে অবলম্বন করেই ঢোকে। বাহ্যিকভাবে হলেও গণতন্ত্রের ধারক-বাহকের পরিচয়েই তারা সরকার কাঠামোয় আশ্রয় খোঁজে। এরপর ধীরে ধীরে সেই কাঠামোর মধ্যে থেকেই ফ্যাসিবাদী দল বা ব্যক্তিরা ক্ষমতা সুসংহত করে, কুক্ষিগত করে। এবং সর্বশেষ ধাপে গিয়ে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয়।

ইতালির বেনিতো মুসোলিনির শাসন ও জার্মানিতে এডলফ হিটলারের শাসনকে ফ্যাসিবাদের উত্তম দৃষ্টান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়। এই দুই ফ্যাসিস্ট শাসকও এভাবেই ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন। তাই ফ্যাসিস্টরা কীভাবে ক্ষমতায় আসে, সেটি বর্ণনার ক্ষেত্রে এই দুই শাসক ও তাদের দলের কর্মকাণ্ড উদাহরণ হিসেবে এসেই যায়। ফ্যাসিবাদ বিষয়ক গবেষক

ফ্যাসিবাদের অর্থনীতি কীভাবে চলে

ফ্যাসিবাদ বললেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সবাই বিবেচনা করে একটি রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাকে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও। এবং এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এটিই ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বন্দোবস্তকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। মজার বিষয় হলো, ফ্যাসিবাদ বলতেই যে হিটলার ও মুসোলিনির কথা আমাদের মাথায় খেলা করে, সেই সময়কার জার্মানি ও ইতালি ছাড়াও আরও কিছু দেশেও এই ফ্যাসিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল। সেসব দেশের মধ্যে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকাও ছিল!

মার্কিন সংস্থা দ্য লাইব্রেরি অব ইকনোমিকস অ্যান্ড লিবার্টি বলছে, ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আসলে সমাজতান্ত্রিক, যার পুঁজিবাদী মোড়ক আছে। তবে ফ্যাসিবাদের অর্থনীতি বেশ জটিল। ফ্যাসিস্ট সরকারগুলোর মূল লক্ষ্য থাকে, জাতীয়ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। হিটলার ও মুসোলিনির প্রবর্তিত ফ্যাসিবাদ এই লক্ষ্যের বিষয়টিকেই প্রচার করেছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে ফ্যাসিস্ট নেতারা জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়টিকে বুর্জোয়া শ্রেণি, মুনাফাকেন্দ্রিক পুঁজিবাদ ও

ফ্যাসিবাদ
বর্তমান বিশ্ব ও বাংলাদেশ

এই প্রসঙ্গের শুরুতেই উদারবাদী গণতন্ত্র নিয়ে মুখে ফেনা তুলে ফেলা একটি দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় ওঠা একটি মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি ফেলা যাক। ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা চলার সময় পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিস আরেক পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'ফ্যাসিস্ট' বলে অভিহিত করেন। ট্রাম্পকে বেশ স্পষ্টভাবে 'ফ্যাসিস্ট' বলেন কমলা। তবে ট্রাম্পও তো থেমে থাকার মানুষ নন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উল্টো কমলা হ্যারিসকে উদ্দেশ করে বলে দিলেন, আসলে কমলাই ফ্যাসিস্ট। নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্পের বক্তব্য ছিল এমন—'আমি নাৎসি নই। আমি নাৎসিবিরোধী। তিনি (কমলা) নাৎসি, ওকে? তিনি নাৎসি।'

ট্রাম্প ফ্যাসিস্ট কিনা—এই বিতর্ক অবশ্য নতুন নয়। ২০১৭ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই এ নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা চলেছে এবং এখনও চলছে। বিশেষ করে ২০২১ সালে ক্যাপিটল হিলে হওয়া মবের আক্রমণে নেতৃত্ব দেওয়ার পর এই আলোচনার পালে আরও হাওয়া লাগে। ফ্যাসিবাদে প্রবল প্রতাপশালী ক্যারিশমাটিক নেতার আবির্ভাবের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তার সঙ্গে ডোনাল্ড